Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 537 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 537 - 547
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকে বাঙালি নারীর উত্তরণ : অন্তঃপুরের জীবন থেকে পেশাগত জগতে প্রবেশ

তন্ময় রায়
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়, পাঁশকুড়া
Email ID : tanmoy.roy386@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Nineteeth Century, Conservative Soceity, Western Education, Bengali Renaissance, Female Education, female Teachers, female Health, Lady Doctor.

Abstract
With the advent of British rule and the spread of Western education, a wave of Renaissance swept through Bengali society. Breaking through the chains of stagnation, the society gradually moved toward progress. The true measure of a society's progress lies in the status of its women. If women are denied advancement, that society cannot truly claim to be progressive. From this standpoint, it is evident that colonial Bengal experienced a progressive transformation.

Bengali women, though restricted by traditions like sati, *child marriage, and the* kulin *system, slowly began to emerge as capable and contributing citizens. Their difficult journey toward self-expression and empowerment was aided by Western-educated Indians, foreign educators, and missionaries. Through their efforts, and with support from the colonial government, certain regressive customs and discriminatory practices against women were challenged and gradually abolished through legislation.*

*As a result, women began to step out of the domestic seclusion (*antahpur*) and entered the world of education. They not only embraced learning but also began to establish themselves professionally, shoulder to shoulder with men. This major social transformation unfolded predominantly during the 19th century. While the beginning of the century witnessed women as victims of purdah, child marriage, and* sati, *by the end of the century, some had emerged as modern doctors and professionals. This transition redefined 19th-century Bengal in a profound way.*

A closer analysis reveals how social evils acted as barriers to women's progress in the early 19th century. At the same time, it is essential to examine how these barriers were dismantled through reform efforts, allowing women access to education and self-awareness. Eventually, breaking the veil of purdah and defying conservative backlash, women tasted the fruits of education. Once they entered the academic world, many began dreaming of a

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 537 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

life beyond domestic confines. Gradually, they stepped into the professional sphere.

Teaching and medicine became preferred career paths for educated women of the time. However, this transition was far from smooth. Even the educated sections of society were divided on the necessity and appropriateness of women pursuing careers. In addition, conservative ridicule and governmental restrictions posed significant challenges.

This essay attempts to present a comprehensive picture of the social journey of Bengali women during the 19th century, highlighting both the obstacles and achievements that marked their path toward empowerment.

Discussion

বর্তমানে নারী ভিত্তিক ইতিহাসচর্চা গবেষকদের কাছে একটা আগ্রহের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতকে নারীদের চলমানতা অবশ্যই নারীদের ইতিহাস নিয়ে গবেষনার দাবী রাখে। মেয়েদেরও যে একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে কিংবা তারাও যে ইতিহাসের একটি অঙ্গাঙ্গী অংশ তা বুঝতে আমাদের বহুদিন সময় লেগেছে। পাশ্চাত্যে বহু আগে নারী ভাবনার উদ্ভব ঘটেছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মেরী ওলস্টোনক্রাফট রচিত 'Vindication of the Rights of Woman' নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি নারীর অধিকার ও নারীবাদী দর্শনের প্রথম বিস্তারিত দলিল।[১] যেখানে সমাজে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। ভারতবর্ষে নারীর অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত দেখতে পাই উপনিবেশিক শাসনকালে। বিশেষত বাংলায় উনিশ শতকের পূর্বে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি কার্যত অবহেলিত ছিল। অশিক্ষা, অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ, কুলীনপ্রথা, সতীপ্রথা, মেয়েদের কঠোর বৈধব্য জীবন যাপন, পুরুষদের বহুবিবাহ, সম্পত্তিতে অনধিকার ইত্যাদি বঙ্গনারীর জীবনকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে পঙ্গু করে রেখেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নারীর অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষদের সহমর্মিতার সূত্র ধরে নারী জগরণের সূচনা হলেও শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পুরুষদের সাথে সাথে নারীরাও নিজেদের কথা বলতে শুরু করেছিল। আধুনিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত মেয়েরা নিজেদের আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করতে শুরু করেছিল। আমরা এই প্রবন্ধে দেখার চেষ্টা করবো কীভাবে চিরাচরিত সমাজের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উনিশ শতকে বাংলার নারীরা অর্থনৈতিক ভাবে নিজেদের পুরুষদের সমকক্ষে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বঙ্গদেশে সেই সময় যে আধুনিকিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার অভিঘাতে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ মহিলারা কতটা সুযোগ পেয়েছিল নিজেদের যুগোপযোগী করে তুলতে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে আমরা দেখে নেবো উনিশ শতকের শুরুতে সমাজে মেয়েদের অবস্থান কিরূপ ছিল এবং ক্রমশ কীভাবে তাদের অবস্থান পরিবর্তন হয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মেয়েরা পেশা জগতে প্রবেশ করছে।

এমনটা বলা হয়তো অযৌক্তিক হবে না যে উনিশ শতকে বাঙালিসমাজে মেয়েরা তাদের জন্মলগ্ন থেকেই ছিলেন সামাজিক ভাবে অবহেলিত। তাঁদের জীবন ছিল শিক্ষার আলোকবর্জিত, বহির্জগতের সাথে সম্পর্করহিত এবং প্রায় সকল সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বাল্যবিবাহ, কুলিনপ্রথা, অকাল বৈধব্য, সতিদাহ ইত্যাদির শৃঙ্খলায় মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করতো এক ভয়াভয় জীবন। বাল্যবিবাহ একটি মেয়ের শৈশব কেড়ে নেওয়ার প্রথম ধাপ ছিল। অসংখ্য সাহিত্য ও পত্রপত্রিকায় তৎকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন চর্চা আমরা পরিলক্ষিত করি। কিছু পত্রিকা যেমন এই প্রথার অন্ধকার দিকটি তুলে ধরেছিল তেমনই কিছু পত্রিকা আবার এর সপক্ষে মতামত রেখেছিল। বাল্যবিবাহ কতটা দৃষ্টিকটু ছিল তার একটা উদাহরণ হিসেবে গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা পত্রিকায় ১৮৭৩ এর মে মাসে প্রকাশিত একটি সংবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বলা হচ্ছে ঢাকার শাঁখারিবাজারে একটি বিবাহ হয়েছে যেখানে পাত্রের বয়স ৩৮ বছর এবং কন্যা ১৩ মাসের।[২] বাল্যবিবাহ শুধু যে বয়েসের পার্থক্যের দিক থেকে দৃষ্টিকটু ছিল তাই নয় বরং বাল্যবিবাহের পর অল্প বয়েসে সন্তান প্রসব প্রসূতি এবং শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ ছিল। সমসাময়িক একটি পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, সিরাজগঞ্জের ভাঙাবাড়ি এলাকায় এগারো বছরের এক বালিকা তিন দিন প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করে একটি মৃত সন্তান প্রসব

করেছে।[৩] এই বাল্যবিবাহ যাতে আইন করে বন্ধ করা হয় তার জন্য দাবী জানানো হতে থাকে। কেশবচন্দ্র সেন এই প্রথার বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা নেন। ১৮৭১ এ তিনি 'Social Reform Association' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। নারীর বিয়ের সর্বনিম্ন বয়েসের জন্য ডাক্তারদের থেকে পরামর্শ গ্রহন করেন। এক্ষেত্রে ১৪ বছর বয়েসকে ডাক্তাররা সঠিক বয়স হিসেবে মান্যতা দিলে কেশবচন্দ্র আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হন। অবশেষে ১৮৭২ এ সরকার 'বিশেষ বিবাহ আইন' কিংবা 'তিন আইন' পাস করে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৪ ও ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর বয়সকে বিবাহের ন্যূনতম বয়স হিসাবে গণ্য করা হয়।[৪] অবশ্য বৃহত্তর হিন্দু সমাজে এই আইনের খুব একটা প্রভাব ছিল না।

সেই সময় বাঙালি নারীদের আরও একটি অভিশাপ ছিল কুলীন বহুবিবাহ প্রথা। বাল্যবিবাহের ন্যায় কুলীন প্রথাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের অসহায় জীবনের নানা কথা তৎকালীন সাহিত্য, পত্রপত্রিকা ও আত্মজীবনীতে আমরা দেখতে পাই। কুলীন প্রথার স্বরূপ ব্যখ্যা করতে গিয়ে বামবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যেতে পারে। যেখানে বলা হচ্ছে, বরিশালের কলসকাঠির ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০৭টি বিবাহ করেন। আবার বর্ধমানের ভাটাকুলের কিশোরীমোহন মুখপাধ্যায়ের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৫। অন্যদিকে কুড়ি বছর বয়সের দুই ব্রাহ্মণ যুবক ইতিমধ্যেই ১১ এবং ৭টি বিবাহ করে ফেলেছেন।[৫] এহেন প্রথার বিপক্ষে ক্রমশ জনমত গড়ে উঠতে থাকে। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর সকলেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে একজনের কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন, তিনি হলেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ইনি নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও বহুবিবাহকারী কুলীন ব্রাহ্মণদের উপহাস করে এবং কুলীন কন্যাদের দুঃখ নিয়ে একাধিক গান রচনা করেছিলেন যা সেই সময় শুধু জনপ্রিয়ই হয়েনি বরং সমাজকে সচেতন করতেও সহায়তা করে।[৬] মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন হতে শুরু করে। এমনকি মহিলারাও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে ঢাকার বিক্রমপুরের আঠারো বছর বয়স্কা কুলীন কন্যা বিধুমুখীর কথা বলা যেতে পারে। তার সাথে বারো তেরোটি স্ত্রী বর্তমান এমন একজন কুলীন ব্রাহ্মনের বিয়ে ঠিক হলে বিধুমুখী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীকালে ভারত সরকারের ডেপুটি কন্ট্রোলার অব পেপার কারেন্সি রজনীনাথ রায়ের সঙ্গে বিধুমুখী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।[৭] এইভাবেই মেয়েদের মধ্যে এইকুপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে উঠতে থাকে।

উনবিংশ শতকের প্রাক্কালে হিন্দু সমাজে সহমরণের প্রবনতা দেখা যায়। যদিও বেশিরভাগ সময় প্রায় জোরপূর্বক স্বামীহারা মেয়েটিকে সহমৃতা হওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো তবুও এরকম দেখা গেছে যে অনেক সময় স্ত্রী স্বেচ্ছায় মৃত স্বামীর সাথে সহমরণে যাচ্ছেন। এই সংক্রান্ত একটি সংবাদ ১৮২৪ এ সমাচার দর্পনে প্রকাশিত হয়েছিল।[৮] কিন্তু প্রশ্ন হল কেন মেয়েরা এই যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যুকে বেছে নিত। তার কারণ সম্ভবত তাঁদের সামনে সতী হওয়ার মহান আদর্শকে তুলে ধরা হত। সহমরণের দ্বারা পূন্যার্জন সম্ভব এমন একটি বদ্ধমূল ধারণার আদর্শে তারা শৈশব থেকে বড়ো হয়ে উঠতো।[৯] কিন্তু ক্রমেই এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে শুরু করে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সতীদাহ ঘটনা ঘটার পাশাপাশি সমাজের একাংশ বিশেষত পাশ্চাত্য শিক্ষিত উদার মনভাবাপন্ন গুটিকয় মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ রীতিমত শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে এই অমানবিক প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে চাইলেন। অবশেষে রামমোহনের প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন বলবৎ হল এবং আইনত বাংলার মেয়েরা জীবন্ত পুড়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

সেই সময় সমাজ নারীদের প্রতি এতই বিরূপ ছিল যে সতিদাহ প্রথা বন্ধ হলেও বিধবা মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করে থাকতো এক নিদারুন দুঃসহ বৈধব্য জীবন। নানা প্রকার বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হত বাঙালি বিধবাদের জীবন। যেসকল মেয়েরা বালিকা অবস্থায় বিধবা হত তাঁদের বাকি জীবন ছিল কৃচ্ছসাধনের মলাটে আবৃত্ত। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ক্রমশ একটি প্রশ্ন ঘুরতে শুরু হল যে বিবাহের বয়েস হয়েনি যাদের তাদের কেন পুনর্বিবাহের অনুমতি দেওয়া হবে না। সময়ের সাথে সাথে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বাদানুবাদ ও শাস্ত্রে এর মান্যতা নিয়ে বাঙালি সমাজ অশান্ত হয়ে ওঠে। কুলীন প্রথা এই বৈধব্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। কারণ একজন কুলীন অসংখ্য বিয়ে করতো ফলে পুরুষটি মারা গেলে একসঙ্গে অনেকে বিধবা হত। বিধবাদের নানা অমানবিক সামাজিক আচার আচরণের পালনের পাশাপাশি তাদের প্রায়ই দাসীর মত জীবনযাপন করতে হত। সমাজ ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 537 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরিবারে তাদের অমঙ্গলের প্রতীক বলে মনে করা হত বলে কোনো শুভ কাজে তাদের গ্রহনযোগ্যতা ছিলনা। অনেকসময় বাল্যবিধবারা কুপ্রলোভনের ফাঁদে পড়ে পঙ্কিল জীবনে প্রবেশ করতো। যেখান থেকে গর্ভপাতের মত বিষয় বৃদ্ধি পেতে থাকে যা থেকে বিধবা মেয়েদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে থাকে।[১০] যাই হোক, অবশেষে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন বলবত হয়। ঐ বছরের ৭ই ডিসেম্বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বাল্যবিধবা কালিমতি দেবীকে আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ করেন।[১১]

সতিদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিণ্যপ্রথা, বহুবিবাহ, সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে বঙ্গসমাজের অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে কোনো কোনো সমাজ সংস্কারক বাংলার মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে তৎপর হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে রাজপথের আলোয় বের করে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টার আড়ালে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কয়েক হাজার বছরের অবরোধ প্রথা। অবশ্য এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে সমাজের নিম্নবিত্ত কিংবা অন্ত্যজ শ্রেণির মহিলারা কিন্তু উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলাদের মত অন্দরমহলের জীবনযাপনে খুব একটা অভ্যস্ত ছিলেন না। প্রধানত রুজিরুটির কারণেই তারা বহির্জগতের সাথে যুক্ত ছিল। অন্যদিকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নেওয়াটাই ছিল অনভিপ্রেত। সন্তানধারণ, রান্নাবান্না, গৃহ পরিচালনার মধ্যেই তাদের জীবন নির্দিষ্ট ছিল। বলা বাহুল্য উনিশ শতকে বাংলার মহিলাদের প্রতি সামাজিক অবরোধের কঠোরতা চরম আকার নিয়েছিল। অবগুণ্ঠনের আড়ালে তাদের বন্দি থাকতে হত। বাংলার প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা রাসসুন্দরী দেবী লেখা থেকে এর একটি চিত্র আমরা পাই। তিনি বলছেন, -

> "বিশেষত তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাত খানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কইবে না, তাহা হইলেই ভালো বৌ হইল। সেকালে এখনকার মত চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম।"[১২]

মুসলমান বাঙালি পরিবারে স্বাভাবিক ভাবে পর্দার কঠোরতা ছিল আরও বেশি। বেগম রোকেয়া মুসলিম মেয়েদের পর্দাপ্রথার একাধিক ঘটনা তার লেখায় প্রকাশ করেছেন সেরকমই একটি ঘটনা উল্লেখ করলে মুসলিম সমাজের পর্দা প্রথার কঠোরতাকে উপলব্ধি করা যাবে। রোকেয়ার এক সম্ভ্রান্ত আত্মীয়া কিউল স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠছিলেন। ভারী বোরখা পরিধানের জন্য তিনি হঠাৎ প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের মাঝের চাপা পড়ে যান। তাঁর সঙ্গে পরচারিকাটি তাঁকে তুলবার বহু চেষ্টা করেও বোরখাটি আটকে যাওয়ায় তিনি উঠতে অসমর্থ হন। উপস্থিত কয়েকজন কুলি সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও পরিচারিকাটি তাদের সাহায্য নিতে অস্বীকার করে। ট্রেন ছেড়ে দিলে মহিলা ওখানেই পিষ্ট হয়ে মারা যান।[১৩]

এত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রগতিশীল মহিলাদের একাংশ ক্রমে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলো। সেকালের নানা পত্রপত্রিকায় মেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও লেখালেখিও শুরু হয়েছিল। তবে উনিশ শতকের প্রাক্কালে মেয়েদের লেখাপড়া বিষয়টি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ খোলা মনে মেনে নিতে পারেনি। চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী মনে করা হত পুরুষদের তুলোনায় মেয়েদের বোধ-শক্তি কম, তাই তাদের লেখাপড়া শেখানো অসম্ভব। স্ত্রীশিক্ষাকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচার সম্মত নয় বলেও প্রচার করা হত। লেখাপড়া শিখলে বিধবা হতে হয় এমন একটি ধারণা সেই সময় প্রচলিত ছিল। রাসসুন্দরী দেবীর লেখা থেকে আমরা দেখতে পাই যে এই বৈধব্যের সংস্কারের ভীতির ফলে মেয়েদের হাতে একখন্ড কাগজ দেখলে তৎকালীন বয়স্কা মহিলাদের মনে ভীতির সঞ্চার হত যার ফল স্বরূপ সেই মেয়েটির প্রতি রাগ প্রতিফলিত হত।[14] নানা সামাজিক সংস্কারের পাশাপাশি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকটিও সেই সময় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। এমনটা মনে করা হত যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে চাকরী বা ব্যবসা করতে পারবে না তাহলে পড়াশোনার প্রয়োজন কি! শুধু তাই নয় উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিক্ষিত মহিলাদের কোনো পুরুষ সহজে বিয়ে করতে চাইতো না। এমনকি একজন শিক্ষিত মেয়ে পরিবারের বোঝা বলেও মনে হত। এহেন বাতাবরণের মধ্যে বাঙালি মহিলাদের দুরবস্থার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রামমোহন রায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। পরবর্তি সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখরা স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।[১৫] উনবিংশ শতকে বিশের দশক থেকে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ছাত্ররাও মহিলাদের সমমর্যাদার দাবী তুলতে থাকে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে এই সময় কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 537 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভদ্রলোক বাড়িতে গোপনে মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। যাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর বিশেষ উল্লেখ্য। বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য তিনি বৈষ্ণবী ও মিশনারী মহিলাদের নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিজের স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।[১৬] এই অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রনালী বেশ সাফল্যের মুখ দেখেছিল। এক্ষেত্রে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম প্রভাবিত হিন্দুদের অবদান বেশী। অবশ্য এর পাশাপাশি মিশনারী এবং কিছু ব্যাক্তিগত উদ্যোগও পরিলক্ষিত হয়। ফলস্বরূপ বেশকিছু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলেও ১৮৫০ থেকে ৬০ এর দশক পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ খুব সামান্য হয়েছিল। কারণ রক্ষনশীল হিন্দু সমাজ এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং যাঁরা নিজেদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতেন তাদের একঘরে করা হত।[১৭]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই চিত্রটি বদল হতে শুরু করে। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে। আগে যেখানে মেয়েদের পড়াশোনাকে বাঁকা নজরে দেখা হত এবং শিক্ষিত মেয়েদের বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতো সেখানে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো শুরু হয় ভালো পাত্রের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য। এ ব্যাপারে প্রাক রবীন্দ্রযুগের অন্যতম সাহিত্যিক নবীনচন্দ্র সেনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি যখন প্রেসিডেন্সিতে পরতেন তখন দশ বছরের একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন এবং পরবর্তিকালে তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি কেবল শুনেছিলেন যে মেয়েটি কিঞ্চিৎ পড়াশোনা জানে এই কিঞ্চিৎ পড়াশোনা তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। নবীনচন্দ্রের লেখা থেকে জানা যায় তাঁর বিবাহের পরদিন থেকেই দেশের ভদ্রলোকেরা তাঁদের মেয়েকে পাঠশালায় পাঠাতে আরম্ভ করলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন লেখাপড়া না শেখালে শিক্ষিত যুবকদের কাছে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া যাবে না।[১৮] জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকাতেও আমরা শিক্ষিত মেয়ের চাহিদার উল্লেখ পাই। যেখানে বলা হচ্ছে, -

> "এক্ষণকার যুবকরা শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন, কেনই বা না চাহিবেন? যুবকদিগকে লেখাপড়া শিখাইলে স্ত্রীদিগকেও অবশ্য লেখাপড়া শেখাইতে হবে।... শিক্ষিত পুরুষের সহিত অশিক্ষিত স্ত্রীর বিবাহ হইলে, সবদিক সুখজনক হয় না, বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে অন্তর, তাহাই কত সময় অনিলের কারণ হইয়া ওঠে।"[১৯]

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধীরেধীরে দেখা যায় রক্ষণশীল অবিভাবকরা মেয়েদের অল্পবিস্তর শিক্ষা দিতে শুরু করে। ফলত, উনিশ শতকের সত্তর-আশির দশক থেকে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার বৃদ্ধি পায়। মেয়েরা স্কুলশিক্ষার গন্ডি পেরিয়ে উচ্চশিক্ষার পথে পা বাড়ায়। চন্দ্রমুখি বসু প্রথম মেয়ে যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে তখনও মেয়েদের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খোলেনি। প্রাথমিক নিয়মের বেড়াজাল কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ অবধি মেয়েদের পড়াশোনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার খুলে দেয়। এই সূত্র ধরে আরও দুজন নারী কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়।[২০] যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের উচ্চশিক্ষা লাভের স্বীকৃতির বিপক্ষে সমাজের এক শ্রেনীর মানুষ লড়াই করেছিল তথাপি উদারপন্থিরা একে স্বাগত জানায় এবং বাঙালি মেয়েরা লেখাপড়া শিখে বৃহত্তর পেশাজগতে প্রবেশ করে।

উনিশ শতকের প্রাক্কালে বাঙালি সমাজে নারী ও পুরুষের কর্ম পরিধির একটা সুক্ষ্ম সীমারেখা ছিল। সে সময় মেয়েদের বিচরণের ক্ষেত্র ছিল মূলত গৃহজগৎ ও পরিবার। বাস্তবিক দিক থেকে তারা অন্তঃপুরের গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে পুরুষদের কর্মপরিধি ছিল বহির্জগতে সম্পৃত্ত। কিন্তু ক্রমশ মহিলারা নিজেদের যোগ্যতার দ্বারা বহির্জগতে প্রবেশ করে। পেশার জগতের পাশাপাশি রাজনৈতিক জগতেও বিচরণ শুরু হয়। অবশ্য এক্ষেত্রেও বলে রাখা ভালো যে পারিবারিক প্রয়োজনে দরীদ্র কিংবা নিম্নশ্রেনীর পরিবারের মহিলারা বহির্জগতে বিভিন্ন আর্থিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিল। সেই সময় বাঙালি মহিলাদের মধ্যে কেবল দাসী, অশিক্ষিত ধাই এবং বারবণিতাদের স্বাধীন আয় ছিল। তা ছাড়া শ্রমজীবিদের মধ্যে মহিলারা গৃহপালিত জন্তুদের খাইয়ে, গরু দুইয়ে, ধান ভেনে এবং মাছ বিক্রি করে তাদের পুরুষদের সাহায্য করতেন। অর্থাৎ এক কথায় নগদ অর্থ আয় করুক না করুক, নিম্ন শ্রেণীর মহিলারা গুরুত্বপুর্ণ আর্থিক ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু ভদ্র পরিবারের মহিলাদের আর্থিক কার্যকলাপে অংশগ্রহন করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও অনেকটা সময়। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, পরিবারের উপর ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ ও পরিবর্তিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে মহিলাদের কর্মজগতে প্রবেশ করার প্রবণতা তৈরি করে।[২১] অবশ্য

উনিশ শতকের প্রারম্ভে ভদ্র পরিবারের মহিলারা যে একেবারে পেশাহীন হয়ে ছিলেন তা হয়তো সম্পুর্ন সঠিক নয়। সেই সময় অন্যতম পেশা ছিল গল্পবলিয়ে মহিলা। অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর লেখা থেকে জানতে পারি যে তাঁর বালক বয়সে জনৈক বিধবা সৌদামিনী তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতে গল্প বলতে আসতেন। গল্প বলার বিনিময়ে তিনি পেতেন মাসকাবারি চাল-ডাল, তরিতরকারি, মশলাপাতি, নুন এবং আট আনা পয়সা। এছাড়া পুজোর সময় তিনি পেতেন একটা করে থান। এঁদের জীবিকার মূলধন ছিল কল্পনাপ্রবণতা, মধুর বাগভঙ্গি ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতা। সেই সময় কলকাতার কোনো কোনো গৃহস্থ মেয়ের আর একটি পেশা অবলম্বনের কথা জানা যায়। তা হল পুঁথি ও পান্ডুলিপি অনুলিখনের কাজ। এই পেশা অবলম্বনের জন্য লেখাপড়া জানা ও সুন্দর হাতের লেখা জানা অন্যতম শর্ত ছিল। খুব সামান্য লেখাপড়া জানা মেয়েদের স্বামী ও পিতা বা পুরুষ অভিভাবকদের কেউ বাইরে থেকে পুঁথি বা পান্ডুলিপি অনুলিখনের কাজ সংগ্রহ করে আনতেন। মেয়েরা ঘরে বসে কাজটি সম্পন্ন করতো। উনিবংশ শতকের দ্বিতীয় শতক অবধি এদের জীবিকার ধারা অব্যাহত থাকে। পরে ছাপাখানার ব্যবহার জনপ্রিয় হলে মেয়েদের এই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আঠারো-উনিশ শতকের মেয়েদের আরও একটি পেশার কথা জানা যায়, সেটি হল পটচিত্র অঙ্কন। কালিঘাট মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ও নিকটবর্তী পটুয়াপাড়ায় পটচিত্র অঙ্কনের যে ব্যাপকপ্রসার ছিল তাতে বহু মেয়ে শিল্পীও পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত ছিলেন।[২২]

শিক্ষিত মহিলারা যখন পেশাজগতে প্রবেশ করলেন তখন যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলো মহিলাদের জন্য নিজেদের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল তাঁর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগন্য হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। ফলে প্রথমদিকে শিক্ষিত মহিলারা শিক্ষকতা ও চিকিৎসাবৃত্তিকে প্রথমিক ভাবে পছন্দের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ১৯০১ এর জনগণনার একটা তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। দেখা যায় সেখানে ৭২৫ জন মহিলা নিজেদের চাকুরীজীবী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করান। এর মধ্যে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও শিক্ষক ছিলেন ৫৮৭ জন, প্রশাসনিক ও অন্যান্য পরিদর্শকের পদে ছিলেন ৬ জন, প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত চিকিৎসক ১২৪ জন, ফটোগ্রাফার ৪ জন এবং লেখিকা, সম্পাদিকা ও সাংবাদিক ৪ জন।[২৩] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ক'জন মহিলা নিজেদের চাকুরীজীবী হিসেবে জনগণনায় নাম নথিভুক্ত করান তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী হলেন শিক্ষকতার সাথে যুক্ত এবং তারপরেই চিকিৎসার সাথে যুক্ত। তবে একটা বিষয় এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন যে জনগণনায় পেশাদার চাকুরীজীবী হিসেবে যত সংখ্যক পুরুষ নিজেদের নাম নথিভূক্ত করান সেই সময়ের নিরিখে মহিলারা ততটা উদ্যোগী হতেন না। এই সকল কর্মজীবি মহিলারা প্রায় সবাই ছিলেন ব্রাহ্ম এবং দেশীয় খ্রিস্টান। কর্মজীবি মহিলাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ছিলেন হিন্দু ও মুসলমান, এরা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রম।[২৪]

তৎকালীন সময় শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে শিক্ষকতা ছিল সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য পেশা। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে এর পেশার গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত প্রাথমিক ভাবে পুরুষ শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় শুরু হলেও রক্ষণশীল সমাজের নানা বাধাবিঘ্নের ফলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মহিলা শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হতে থাকে। এই অনুভবের নিরিখে মহিলা শিক্ষকের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই প্রথমদিককার বেশ কিছু শিক্ষিত মহিলা তাদের অর্জিত জ্ঞানকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিক্ষকতাকেই বৃত্তি হিসেবে গ্রহন করেন।[২৫] উনিশ শতকের ষাটের দশকে মেয়েরা বিভিন্ন নর্মাল স্কুল ও স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক সভা পরিচালিত স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কাজ শুরু করেন।[২৬] সম্ভবত ঢাকার রাজরানী দেবী প্রথম ভদ্রমহিলা যিনি চিরাচরিত সামাজিক রক্ষনশীলতার বাধা কাটিয়ে সবেতনে একটি চাকরী গ্রহন করেন। তিনি ১৮৬৬ সালের শুরুতে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে শেরপুর স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভায় এই চাকরী পান।[২৭] অবশ্য এক্ষেত্রে পাবনা নিবাসী বামসুন্দরী দেবীর নাম উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ লিখিত নথি অনুসারে তাঁর নাম শিক্ষিকা হিসেবে আমরা সর্বপ্রথম পাই। ১৮৬৩ তে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেখানে অন্তঃপুরে শিক্ষাপ্রদানের জন্য (জেনানা শিক্ষাব্যবস্থা) অন্যান্য মেয়েদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম মহিলা অধ্যক্ষ মনোরমা মজুমদার ১৮৬০ এর দশকে প্রথমদিককার শিক্ষিকাদের মধ্যে একজন যিনি বরিশালে তাঁর পেশা জীবন শুরু করেন। পরবর্তিকালে দেখা যায় তিনি ১৮৭৮ এ ষাট টাকা বেতনে 'ঢাকা গভর্নমেন্ট অ্যাডাল্ট ফিমেল স্কুল' এর 'সেকেন্ড মিস্ট্রেস' পদে যোগ দেন।[২৮] এরপর ক্রমশ বাঙালি শিক্ষিত নারীদের মধ্যে শিক্ষকতার চাকরী গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশির দশকে এসে আমরা একাধিক বাঙালি নারীদের শিক্ষিকা হিসেবে

স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে দেখি। রাধারানী লাহিড়ী, চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কুমুদিনী খাস্তগীর, হেমপ্রভা বসু, সুরবালা ঘোষ, সুরবালা মিত্র প্রমুখ বেথুন স্কুল ও কলেজে চাকরী গ্রহন করেন।[২৯]

স্ত্রীশিক্ষার অগ্রসরতার সাথে সাথে শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণের অপরিহার্যতা উপলব্ধি হতে শুরু হয়। বিশেষত বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে পরিদির্শক হিসেবে মহিলা পরিদর্শকের প্রয়োজনীতা অনুভব হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭৬ সালে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জির কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী হুইলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত হলেন। তিনি কলকাতা, চব্বিশ পরগনা এবং হুগলীর দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর বেতন ছিল ২০০ টাকা সঙ্গে ৩০ টাকা 'রাহা খরচ' পেতেন। ১৮৭৯ তে তাঁর 'Bengal Subordinate Educational Service' এ পদন্নোতি হয়। তিনি ইংল্যান্ড ও ইউরোপে গিয়ে সেখানকার স্কুল পরিদর্শনের পদ্ধতি দেখে এসেছিলেন।[৩০] শুধুমাত্র বাংলায় নয় বরং সুদূর প্রদেশেও বাংলার মহিলারা এই সময় শিক্ষকতার চাকরী নিয়েছিলেন। ১৮৯০ তে শরৎ কুমারী চক্রবর্তী অমৃতসরের 'আলেকজান্ডার খ্রিষ্টান গার্লস্ স্কুল'-এ শিক্ষকতার চাকরীতে যোগ দেন। কামিনী বসু 'দেরাদুন গার্লস্ স্কুল'-এর প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। ১৮৯১ তে অঘরকামিনী রায় লক্ষৌ এর ইসাবেলা থোবার্ন টিচার্স কলেজে প্রশিক্ষন নিতে যান এবং ফিরে এসে ১৮৯২ তে বাঁকিপুরে নিজে একটা স্কুল তৈরি করেন। ১৮৯৩ সালে কুমুদিনী খাস্তগীর বেথুন স্কুলের চাকরী ছেড়ে মহিশুরে মহারানী গার্লস্ স্কুলে পড়াতে যান। ১৮৯৫ সালে সরলা দেবীও ৪৫০ টাকা প্রতি মাসে বেতনের বিনিময়ে মহিশুরের মহারানীর ব্যক্তিগত সচীব হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন।[৩১]

শিক্ষকতার পাশাপাশি চিকিৎসা পরিসেবা ছিল উনিশ শতকের মহিলাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ন পেশা। প্রধানত পর্দাপ্রথার কারণেই চিকিৎসাবিদ্যা জানা মহিলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ একটি পরিবারে মেয়েরা অসুস্থ হলে পুরুষ ডাক্তারদের অন্তঃপুরে প্রবেশ খুব একটা গ্রহনযোগ্য ছিল না। তবে এ নিয়ে দ্বিমত আছে। 'নববিভাকর সাধারণী' নামক একটি রক্ষনশীল সংবাদপত্রে বলা হয় যে, মহিলা ডাক্তারদের অভাবে আশাহীনভাবে মহিলাদের মৃত্যু ঘটছে এমনটা নয়। বেশীরভাগ দেশেই জনসংখ্যায় মহিলারা পুরুষদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এবং প্রতিদিন মহিলাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি কখনই সম্ভব হত না যদি চিকিৎসার অভাবে বড়মাত্রায় মহিলাদের মৃত্যু ঘটতো। তবে এর বিপরীতে মহিলা ডাক্তারদের প্রয়োজনীতার সপক্ষে 'Brahmo Public Opinion' এ 'Female Doctors in Bengal' শীর্ষক লেখায় বলা হয়, -

> "We know of several instances in orthodox Hindu families where the female members suffer from the most complicated diseases, but yet would not allow male doctors to visit and treat them. The consequence is, they are treated second-hand through the assistance of uneducated quack native midwives, and in ninety-nine cases out of a hundred, they are never radically cured".[৩২]

অতিপ্রাচীন কাল থেকে বাংলায় মেয়েদের চিকিৎসার জন্য ধাত্রীদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। অন্তঃপুরে মেয়েদের প্রসবের জন্য ধাত্রীদের উপরেই নির্ভর করতে হত। সন্তান প্রসব থেকে শুরু করে প্রসুতির পথ্য, এককথায় প্রসুতিচিকিৎসা পরিচালিত হত ধাত্রীদের দ্বারা। এমনকি শিশুরাও অসুস্থ হলে ধাত্রীদের ডাকা হত। কিন্তু এইসকল ধাত্রীরা ছিল অশিক্ষিত ও আধুনিক চিকিৎসায় অজ্ঞ। ফলে অন্তঃপুরে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ছিল স্বাভাবিক। এমনকি অনেক সময় প্রসূতিরও মৃত্যু হত। ১৮৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী বাংলায় ধাত্রী ছিলেন প্রায় কুড়ি হাজার।[৩৩] তাই অন্তঃপুরের মহিলাদের কাছে যথাযথ চিকিৎসা পৌছে দেওয়ার প্রথম ধাপ ছিল ধাত্রীদের আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত করা। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭০ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ধাত্রীবিদ্যার পাঠক্রম শুরু হয়। ১২ জন মহিলা এই পাঠক্রমে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে।[৩৪] পরে কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল (বর্তমান নীলরতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল) ১৮৮০ এর দশকের প্রথম দিকে মহিলাদের জন্য একটি সেবিকা ও ধাত্রীবিদ্যার পাঠক্রম চালু করে। এইভাবে শিক্ষিত মেয়েদের কাছে আরও একটি পেশা উন্মুক্ত হয়।

সেবিকা ও ধাত্রীবিদ্যাবিষয়ক পাঠক্রম মহিলাদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। বিশেষত হিন্দু বিধবাদের কাছে এই পেশা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল মাঝারি, প্রশিক্ষণকাল ছিল ডাক্তারির তুলনায় কম এবং চাকুরীপ্রাপ্তিও ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমদিককার পাস করা মিহিলা ধাত্রিদের সাফল্যে উৎসাহিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 537 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হয়ে মফস্বল থেকে বহু সভ্রান্ত বিধবা মহিলা এই প্রশিক্ষন গ্রহন করতে আসেন।[৩৫] সমাজে উপযুক্ত সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার আগ্রহে সেই সময় অনেকেই ধাত্রিবিদ্যা শিখতে এসেছিলেন।[৩৬] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সেই সময় সমাজে গর্ভাবস্থা বা প্রসবকালে ধাত্রীদের উপরেই নির্ভর করা হত। তাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারেও শিশুমৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি। প্রশিক্ষিত সেবিকা ও ধাত্রীগণ তাঁদের পেশাদারী কাজ আরম্ভ করলে গর্ভাবস্থায় বা সন্তানপ্রসবকালে সাহায্য করার জন্য তাঁদের ডাকা হয়।[৩৭] ১৮৮০ এর মধ্যে কলকাতায় প্রায় হাফ ডজন প্রশিক্ষিত ধাত্রীর উপস্থিতি ছিল। সেই সময় প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা সমসাময়িক পত্রিকায় নিজেদের বিজ্ঞাপনও দিত। ১৮৭৯ সালে 'Brahmo Public Opinion' এ শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ ও শ্রীমতী থাকমনি রায় নিজেদের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।[৩৮] সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের অনেক সময় অগ্রাধীকার পেত। এর অন্যতম কারণ ছিল একজন প্রশিক্ষিত ডাক্তারের থেকে কম বেতনে তাদের নিয়োগ করা যেত।[৩৯]

বাংলার অনেকেই নিজেদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে এবং সমাজে নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তী সময় শিক্ষিত নারীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তনে স্ব-উপার্জিত অর্থে নিজেদের প্রয়োজন পরিপূরনের সুচনা করে এই শিক্ষয়িত্রীরা। মহিলা ডাক্তারদের এ ব্যাপারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কলকাতায় মেয়েদের মেডিকেল পড়ার অধিকার নিয়ে দীর্ঘ টানাপড়েনের পর অবশেষে ১৮৮৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ মেয়েদের ডাক্তারী পড়ার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ভর্তির ন্যুনতম যোগ্যতা হিসেবে এফ.এ. পাশ করা জরুরী ছিল। শুধু তাই নয়, ১৮৮৪ সালে সরকার মহিলা ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য প্রতি মাসে ২০ টাকার স্কলারশিপেরও ব্যবস্থা করে। পাঁচ বছর পর্যন্ত এই স্কলারশিপ দেওয়া হত। ১৮৮৭ সালে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলও মেয়েদের পড়াশোনার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে অবশ্য কলকাতা মেডিকেল কলেজের থেকে অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষগত যোগ্যতা হলেও হত এবং পাঠক্রম ছিল ৩ বছরের।[৪০]

বাংলার প্রথম মহিলা ডাক্তার ছিলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। ১৮৮৩ তে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে আসেন। পাঁচ বছর পড়াশোনা করার পর এম.বি. পরীক্ষায় বসেন। কিন্তু একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হন। তবে ১৮৮৮ সালে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তাকে Graduate of Bengal Medical College (GBMC) উপাধি প্রদান করেন এবং মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ইডেন হাসপাতালে নিযুক্ত হন।[৪১] অবশ্য আর একটি সূত্র মারফৎ জানা যায় যে তিনি এল.এম.এস. উত্তির্ণ হয়ে ১৮৮৮ সালে লেডি ডাফরিন কলেজের ডাক্তার হিসেবে নিযুক্ত হন। বেতন ছিল প্রতি মাসে ৩০০ টাকা। ১৮৯৩ তে তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং আরও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তিনি এডিনবার্গ, গ্লাসগো এবং ডাবলিন থেকে ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফেরেন এবং ডাফরিন হসপিটালের সুপারিটেন্ডেন্ট পদে যোগদান করেন।[৪২] তবে তিনি সেই পদে বেশীদিন ছিলেন না। পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে মন দেন। ১৯৯৫-৯৬ সাল নাগাদ তিনি নেপালের রাজবাড়িতে চিকিৎসা করার জন্য যান এবং মৃত্যুপথযাত্রী রাজমাতাকে বাঁচিয়ে তোলেন।[৪৩] এইভাবে ধীরে ধীরে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তিনি খ্যাতি ও অর্থ অর্জন করেছিলেন। এই খ্যাতির জন্য তাঁকে বিড়াম্বনাতেও পড়তে হয়েছিল। বঙ্গবাসী পত্রিকা তাঁর চরিত্র নিয়ে কটূক্তি পর্যন্তও করেছিল। পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানী মামলা হয় এবং তাঁর জেল ও জরিমানা হয়।[৪৪] উনিশ শতকের শেষ দশকে অবশেষে বাঙালি পেল তাদের প্রথম মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট ডাক্তার, বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র। ১৮৯০ তে বিধুমুখী একসঙ্গে এম.বি. এবং এল.এম.এস. দুটি পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হন।[৪৫] বিধুমুখী ইডেন বা ডাফরিন হাসপাতালের সাথে যুক্ত ছিল কিনা জানা না গেলেও প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসেবে তাঁর ভালো পসার ছিল এবং নেপালের রাজমহিষির চিকিৎসার চাকরী নিয়েছিলেন তা জানা যায়।[৪৬] বিধুমুখীর সহপাঠিনী ছিলেন ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র। ১৮৯০ তে বিধুমুখীর সাথে ডাক্তারী পাশ করেন। তার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ভাগলপুরের জেনানা হাসপাতালে। ১৮৯৩ তে তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবার জন্য কলকাতা ফিরে আসেন। এর এক বছর পরে তিনি বিয়ে করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি চিকিৎসা করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৪৭]

পাশ্চাত্য চিন্তাধারা সমাজে ছড়িয়ে পড়ার পর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভৈষজ সম্পর্কিত মনোভাবেরও পরিবর্তন হয় ফলে প্রশিক্ষিত সেবিকা ও ধাত্রীগণ তাঁদের পেশাদারী কাজ আরম্ভ করলে গর্ভাবস্থায় ও সন্তান প্রসবকালে সাহায্য করবার

জন্য তাদের ডাকা হয়। কিন্তু তখনও বেশীরভাগ লোকেরা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি অথবা বিধুমুখী বসুর মত উত্তীর্ণ চিকিতসকদের প্রতি বিদ্বিষ্ট থাকলেন। এর কারণ স্পষ্ট নয়। এই প্রতিকূল পরিবেশে আগামী দু'দশকে প্রায় কোনো মহিলাই আর সাহস করে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে এগিয়ে আসেনি। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে, প্রকৃতপক্ষে মাত্র একজন বাঙালি মহিলাই- যামিনী সেন- মেডিকেল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন।[৪৮] তিনি ১৮৯৭ সালে এল.এম.এস. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৯৯ এ তিনি নেপাল যান। পরবর্তি সময়ে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য গ্লাসগো ও ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তিনি সারা জীবন অবিবাহিত থাকেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চায় নিজেকে নিবেদন করেন।[৪৯] আসলে সেই সময় শিক্ষিত ও ধনী বাঙালিরা সাহেব ডাক্তারদের বিশ্বাস করতেন বেশি। তার উপর দেশীয় ডাক্তারদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনিতা এবং রক্ষণশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের ডাক্তারী পেশাকে বারবার বাধাপ্রাপ্ত করেছিল।

উনিশ শতকের শেষদিকে কোনো কোনো মহিলা ফটোগ্রাফি চর্চাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয় মহিষী মনোমোহিনী প্রথম ফটোগ্রাফিতে পারদর্শিতা অর্জন করেন। কিন্তু ফোটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে প্রথম গ্রহন করেন সরোজিনী ঘোষ। ৩২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে 'মহিলা আর্ট স্টুডিও' স্থাপন করে তাঁর পেশা দক্ষতার সাথে চালাতে থাকে। তাঁর স্টুডিওতে সিল্কের উপর ফোটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি গ্রহণের ব্যবস্থা হয় এবং ফোটোগ্রাফিক কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদিও বিক্রি হতে থাকে। পরবর্তীকালে অন্নপূর্ণা দত্ত, চঞ্চলাবালা দাসী প্রভৃতি মহিলাগণ বিশেষ দক্ষতার সাথে ফোটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং কাজ করে যান। ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত 'নারী শিল্পশিক্ষালয়' নামক প্রতিষ্ঠানে টাইপরাইটিং, ঘড়ি মেরামতি, ফ্রেট ওয়ার্কস্ ও ফোটোগ্রাফি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।[৫০] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এইভাবে ধীরেধীরে বাঙালি ভদ্রমহিলাদের জন্য উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হতে থাকে এবং বাঙালি মেয়েরা বহুবিধ কর্মকান্ডে ক্রমশ জড়িত হন। অন্তঃপুরের সীমানা অতিক্রম করে নিজস্ব উপার্জনের দ্বারা তারা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করেন। অবশ্য এই স্বাবলম্বিতা যে বাধাহীন ভাবে এসেছিল তা নয়। মহিলাদের প্রতি সহানুভূতি ও প্রাগসর চিন্তার জন্য সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মহিলাদের চাকরীকে সমর্থন করেন নি।[৫১] মহিলাদের চাকরী গ্রহণের বিরুদ্ধে ঐতিহ্যিক সমাজের প্রবল প্রতিকূল মনোভাব সত্বেও পূর্বোক্ত কর্মজীবি মহিলাদের দৃষ্টান্ত পরবর্তি মহিলাদেরকে চাকরী নিতে উৎসাহিত করে।

Reference:

১. সেনগুপ্ত, গীতশ্রীবন্দনা, স্পন্দিত অন্তর্লোকঃ আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ০৪

২. গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, মে, ১৮৭৩

৩. সুলভ সমাচার, ১৩ ই কার্তিক, ১২৮০

৪. সেনগুপ্ত, গীতশ্রীবন্দনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২

৫. বামবোধিনী পত্রিকা, জানুয়ারী, ১৮৯৫

৬. গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র, বাংলার নারী জাগরণ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা, ১৩৫২ বঃ, পৃ. ৬১-৬২

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

৮. বসু, স্বপন, সংবাদ সাময়িকপত্রে বাঙালি নারী (১৮০০-১৯০০), অ্যাকাদেমী পত্রিকা, অষ্টম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৪০২ বঃ, পৃ. ৩৯৪

৯. চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ, অন্দরে অন্তরেঃ উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ০৯

১০. সোমপ্রকাশ, ২৪ জুন, ১৮৬৭

১১. গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১২. দাসী, রাসসুন্দরী, আমার জীবন, কলেজ স্ট্রীট পাবলিকশন, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ২৯ (মূল গ্রন্থটি ১৮৭৬ সালে প্রথম ছাপা হয়।)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 537 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৩. কাদির, আব্দুল, সম্পাঃ, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ. ৪৮২
১৪. দাসী, রাসসুন্দরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১৫. Kling, Blair.B, Partner in Empire: Dwarkanath Tegore and The Age of Enterprise in Eastern India, University of California Press, Berkeley, 1976, p. 183
১৬. দেবী, কৈলাসবাসিনী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি, কোলকাতা, ১৮৬৫, পৃ. ৩০
১৭. মুরশিদ, গোলাম, সংকোচের বিহ্বলতা, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৮৫, পৃ. ২৬
১৮. সেন, নবীনচন্দ্র, আমার জীবন (প্রথম ভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩১৯ বঃ, পৃ. ১০০
১৯. স্ত্রীশিক্ষা, জ্ঞানাঙ্কুর, আশ্বিন, ১২৮২ বঃ
২০. গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৯
২১. মুরশিদ, গোলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
২২. সেনগুপ্ত, গীতশ্রীবন্দনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২
২৩. Borthwick, Meredith, ibid, p. 310
২৪. মুরশিদ, গোলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
২৫. Borthwick, Meredith, ibid, p. 314
২৬. সেনগুপ্ত, গীতশ্রীবন্দনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
২৭. মুরশিদ, গোলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
২৮. Borthwick, Meredith, ibid, p. 315-316
২৯. মুরশিদ, গোলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৩০. Borthwick, Meredith, ibid, p. 319
৩১. Borthwick, Meredith, ibid, p. 318.
৩২. Borthwick, Meredith, ibid, p. 320-21
৩৩. দেব, চিত্রা, মহিলা ডাক্তারঃ ভিন গ্রহের বাসিন্দা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ২৭
৩৪. Borthwick, Meredith, ibid, p. 327
৩৫. সেনগুপ্ত, গীতশ্রীবন্দনা, তদেব, পৃ. ১৫৫
৩৬. দেব, চিত্রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৩৭. মুরশিদ, গোলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৩৮. Borthwick, Meredith, ibid, p. 327
৩৯. Borthwick, Meredith, ibid, p. 328
৪০. Borthwick, Meredith, ibid, p. 323
৪১. গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৪২. Borthwick, Meredith, ibid, p. 324
৪৩. দেব, চিত্রা, মহিলা ডাক্তারঃ ভিন গ্রহের বাসিন্দা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১০২
৪৪. দেব, চিত্রা, তদেব, পৃ. ৯৮-৯৯
৪৫. দেব, চিত্রা, তদেব, পৃ. ১০৪
৪৬. দেব, চিত্রা, তদেব, পৃ. ১০৫
৪৭. দেব, চিত্রা, তদেব, পৃ. ১০৮-১০৯
৪৮. মুরশিদ, গোলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬
৪৯. Borthwick, Meredith, ibid, p. 324

৫০. সেনগুপ্ত, গীতশ্রীবন্দনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
৫১. মুরশিদ, গোলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩